সূচিপত্র

ভূমিকা	2
লেখকের কথা	5
সূচিপত্র	6
ইতিহাসের আলোকে ব্যাংক ব্যবস্থা	8
ইসলামী ব্যাংকের মত কোন প্রতিষ্ঠান কি মুসলিমদের ইতিহাসে ছিল?	10
আধুনিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি হল?	12
আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে?	14
ইসলামী ব্যাংক কীভাবে ঋণ দেয়	15
ইসলামী ব্যাংক গুলোর ব্যবসা কাঠামো বিশ্লেষণ	16
ইসলামের দৃষ্টিতে সুদের সংজ্ঞা কী?	21
শুভঙ্করের ফাঁকি	24
লিজিং ও শিরকাতুল মিল্ক	25
পলিসি রেট, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সুদ	28
নস্ট্রো একাউন্ট	31

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 32

শরিয়া বোর্ড 33

ডিপজিট স্কিম 38

ক্যাপিটাল গেইন 42

মুশারাকা ও মুদারাবা 43

টিকা - ইসলামী ক্রেডিট কার্ড 46

সুদের সর্বনাশা ফাঁদ 48

দেউলিয়াত্ব 50

ব্যাংক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য 53

ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ 55

গভীরে ভাবুন 58

শেষ প্রশ্ন 60

সমাধান 65

টিকা - গ্রাহকদের জন্য কিছু বাস্তব ভিত্তিক টিপস 72

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর 73

১. ইসলামী ব্যাংকের উত্থানকে অনেকেই ইসলামী পুনর্জাগরণের অংশ হিসেবে দেখছে। এই বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন? 73

২. সবকিছুর সমাধান যদি ইসলামে থেকেই থাকে, ব্যাংক ব্যবস্থার সমাধান কি? 74
৩. গোটা বিশ্বের স্কলারদের "ইজমা" আছে যেখানে, সেখানে আপনি কেন ইসলামী ব্যাংকিং কে শুভংকরের ফাঁকি বলছেন? 75
৪. ইসলামী ব্যাংকিংকে ১০০ ভাগ হালাল কেউই বলছে না। এর সাথে ৫%-১০% সুদ যে যুক্ত আছে। এই আলোচনা কী সেই পুরোনো কাসুন্দিই নতুন করে ঘেটেছে? 76
৫. ইসলামী ব্যাংক প্রায়োগিক দিক থেকে হয়তো অনেক নিয়মই মানছে না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক যেই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে কি কোন ভুল পরিলক্ষিত হয়? 77
৬. এমন কোন পরিবেশ যদি পাওয়া যায় যেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তাহলে কি তারা 'শুভঙ্করের ফাঁকি' থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে? 77
৭. সুদ ছাড়া কি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? একটি ইসলামী সমাজ ব্যাংক ছাড়া কীভাবে চলবে? 78
৮. এই বইটি পড়ে সাধারন মানুষজন কীভাবে উপকৃত হবে? 79
৯. আপনার কাছে কি কোন উত্তম সমাধান আছে? 79
১০. বইটি কি ইসলামের শত্রুদেরকে শক্তিশালী করবে? 80
১১. এই বইটি লেখার সিদ্ধান্ত আপনি কীভাবে নিলেন? লেখার পেছনে কোন বিষয়গুলো আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে? 80

লেখক পরিচিতি 83

প্রয়োজনীয় শব্দ ও ব্যাখ্যা 84

ইসলামী ব্যাংকিং মুসলিম বিশ্বে নতুন একটি সংযোজন। নতুন-ধারার এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানতে উৎসুক, আবার অনেকেই প্রচন্ড সন্দিহান। তাই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, এর প্রকৃত স্বরূপ, আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে এর মিল-অমিল, সীমাবদ্ধতা ও সমাধান নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

সময়ের পরিক্রমায় একের পর এক নতুন নতুন কার্যক্রম পৃথিবীতে আসে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা তার একটি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং এর নামে অনেক সন্দেহজনক লেনদেন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। অথচ ব্যাংকিং করার জন্য দ্বীনের কিছু অংশে ছেড়ে দিব, এমনটা কাম্য হতে পারে না। বরং দ্বীনকে

পুরোপুরি গ্রহণ করতে হলে ক্ষেত্র বিশেষে দুনিয়ার কিছু অংশ ছেড়ে দিতে হবে। তাই হালাল-হারাম মিশ্রিত ইসলামী ব্যাংকিংকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা ইসলামী দর্শনের পরিপন্থী বলে আমি মনে করি। তাই সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিপরীতে প্রকৃত ইসলামী ফাইন্যান্সিং শারী'আহ সম্মত পদ্ধতি যথাযথভাবে সমাজে প্রচলন করতে হবে এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় সুদকে পরিত্যাগ করে হালাল পদ্ধতি গ্রহণ এবং ব্যপকভাবে প্রচার করতে হবে।

যদিও ইসলামী ব্যাংকের প্রচলিত মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি কঠোর ভাবে নিয়ম কানুন অনুসরণ সাপেক্ষে হালাল , তবে তা যে উত্তম পদ্ধতি নয় এ বিষয়ে সকল স্কুল অফ থটের ইসলামী চিন্তাবীদ একমত। সমকালীন ইসলামী অর্থনিতিবীদ এবং ইসলামী ব্যাংকিং এর অন্যতম দিকপাল বিচারপতি মাওলানা তাকি ওসমানীর সাহেবের লেখাতেও এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর "An Introduction to Islamic Finance" বইতে লিখেছেন "this instrument should be used as a transitory step taken in the process of islamization of the economy, and its use should be restricted to those cases where mudaraba and musharaka are not practicable." তাছাড়া তিনি বেশ কিছু শর্ত উল্লেখ করে বলেন "If these conditions are neglected, the transaction becomes invalid according to Shari'ah." কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম যেভাবে চলছে তা পর্যালোচনা করলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে অনেক ইসলামী ব্যাংক পণ্য ক্রয়ের নাম করে কৌশলে গ্রাহকদেরকে সরাসরি অর্থ প্রদান করছে। ফলে সুদী ব্যাংকব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য আছে কিনা সেই ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে; বিশেষ করে মুরাবাহা, বায় মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে।

সকল মহলে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে যে বাংলাদেশে যেসব ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং করছে, সেগুলো সুদের বিপরীত ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য করছে কিনা? তার অন্যতম প্রধান একটি কারণ হল উক্ত ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদের অনেকেই সুদী ব্যাংকগুলোর সাথে স্বাচ্ছন্দে লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে ইসলামের দর্শন প্রতিষ্ঠা করার তুলনায় পুঁজি বৃদ্ধির করার প্রবণতা ও গুরুত্বই তাদের কাছে অগ্রগণ্য। বর্তমানে সিটি (CITI) ব্যাংক, এইচএসবিসি (HSBC) এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড (Standard Chartard) এর মালিকপক্ষ অমুসলিম হয়েও ইসলামী ব্যাংকিং করছে! তার কারণও হচ্ছে মূলত পুঁজি বৃদ্ধি।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাদের একাংশও ইসলামী ফাইন্যান্স সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না। এমনকি ইসালামী আদর্শ বাস্তবায়নও তাদের লক্ষ্য নয়। নিছক পুঁজিবৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের প্রবেশ। এভাবে গণহারে ইসলামী ব্যাংকিং খাতে পুঁজিপতিদের এসে পুঁজি বৃদ্ধি করা ইসলামী অর্থনীতির মূল চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়; যেমন সংগতিপূর্ণ নয় বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে গুটিকতেক বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীকে সহজ শর্তে এবং কম মুনাফায় বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের ব্যবসায়ীদেরকে সুবিধ বঞ্চিত করা।

তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার যেসব ত্রুটি বিচ্যুতির দাবী আসছে তা আমলে নেওয়া সময়ের অপরিহার্য দাবী। অন্যথায় সমাজে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে তা নিরসন করা খুব একটা সহজ হবে না।

মোঃ মুখলেছুর রহমান

বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবীদ, ইসলামী ব্যাংকার এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শারী' আহ বোর্ডের সাবেক সদস্য।

লেখকের কথা

কিছু কাজ আছে যেগুলো করার সময় মনে হয়, "এটি শেষ করা পর্যন্ত যেন বেঁচে থাকি।" আমার জীবনে “ইসলামী ব্যাংকিং এর শুভঙ্করের ফাঁকি” ছিল এমনই একটি কাজ। কারণ, এই বইতে এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি উঠে এসেছে যে আলোচনাটা শেষ করার জন্য বেঁচে থাকার বাড়তি একটি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।

বইটি আমার কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ হবার কারণ হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সমস্যাগুলোকে নিয়ে লেখা এতো গভীর বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আগে কখনো দেখিনি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বইটিতে সমস্যা বিশ্লেষণের পাশাপাশি সমাধান নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে সবার জন্য সুখপাঠ্য করতে বইটির ভাষা খুব সরল রাখা হয়েছে এবং গল্পের আকারে বিষয়াদি বর্ণনা করা হয়েছে।

বইটি লিখতে গিয়ে যেই প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, “আপনি তো কোন আলেম না। তাহলে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে মন্তব্য করছেন কেন?” আসলে ইসলামী ব্যাংকগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি যেমন - মুদ্রা ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম, কল মানি রেট ইত্যাদিও অর্থনৈতিক বস্তুই। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করার জন্য অর্থনৈতিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পাঠকদের অবশ্য নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই এই ভেবে যে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান না রেখেই লেখক বইটি লিখে ফেলেছেন। সুদ, ব্যবসা এবং ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত ‘প্রয়োজনীয়’ শরিয়া আইন অধ্যয়ন শেষেই বইটি লেখা হয়েছে এবং বইয়ের ভেতরে কোরান, হাদিস ও আওফির নীতিমালা উল্লেখ পূর্বক সব খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরেকটি প্রশ্নের মুখোমুখী আমাকে হতে হয়েছে যে, “শরিয়া বোর্ডের সাথে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন কি?” সত্যি কথা বলতে একটা বা দুইটা নয়, ততোধিক শরিয়া ব্যক্তিত্য, ইসলামী অর্থনীতিবীদ এবং এই সেক্টরে কর্মরত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করেই বইটি লেখা হয়েছে।

বইটি লেখার কাজে যাদের সাহায্য পায়েছি তাদের সবাইকে জানাই ধন্যবাদ। ইতিমধ্যেই পাঠকদের পক্ষ থেকে এই বই এর ব্যাপারে ভালো রিভিউ পাচ্ছি। খুব সরল ভাষায় লেখা এই বইটি ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে এবং বর্তমানে যেই কুটকৌশল চলছে সেগুলো পাঠকদের সামনে উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এখন পর্যন্ত কেউ বলেনি বই দুর্বোদ্ধ হয়েছে। সবাই সঠিক পদ্ধতি এবং কূট কৌশল বুঝতে সক্ষম হয়েছে। আপনারা যারা এখনও বইটি পড়েননি তারা আজই সংগ্রহ করে ফেলুন। আশা করি বহু ত্যাগের বিনিময়ে লিখিত এই বইতে আপনাদের মনের প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবেন এবং ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে সন্দেহের অবসান হবে।

ইতিহাসের আলোকে ব্যাংক ব্যবস্থা

ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাস অনেক পূরান। প্রাচীন ব্যবিলন, রোম, ভারত ও চীন সহ বিভিন্ন স্থানে আজকের মত ব্যাংক ব্যবস্থা চালু ছিল। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যবিলনে বর্তমান বিশ্বের ব্যাংকব্যবস্থার মতই ঋণ লেনদেন ব্যবস্থা চালু ছিল। সেই সময়ের মাটির ফলকগুলো বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ৩৭০০ বছর আগে পাথরে খোদাই করা হাম্মুরাবি কোডেও ঋণ আদান প্রদানের নীতিমালার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর জুলিয়াস সিজারতো (প্রাচীন রোমের রাজা) ব্যাংকের সপক্ষে আইনই জারি করেন।[1]

[1] ফোর্বস ম্যাগাজিনের অনলাইন প্রতিবেদন লিংক - t.ly/QKT6

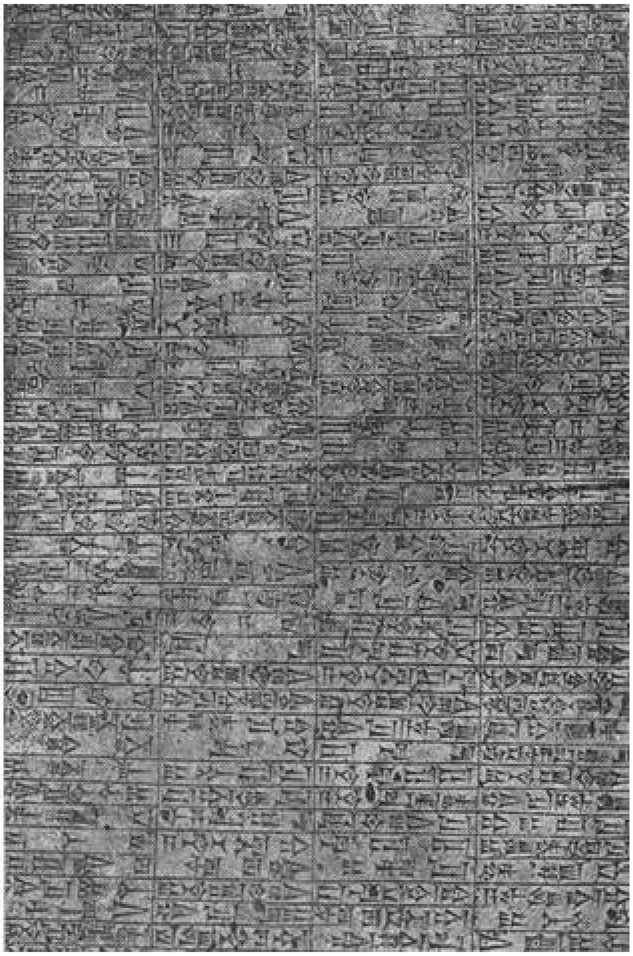

চিত্রঃ কোড অফ হাম্মুরাবি। আজ থেকে প্রায় ৩৭০০ বছর আগে (রাসুল সা. এর জন্মের প্রায় ২,২৫০ বছর আগে) ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবির সময়ের এই ফলকে সুদ-সমেত টাকা ঋণের নীতিমালার বর্ননা আছে।

তবে প্রাচীন যুগের ব্যাংকগুলো অবশ্য সবদিক থেকে আজকের বিশ্বের ব্যাংকগুলোর মত ছিল না। আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থা বলতে আমরা যা বুঝি, তার শুরু রেনেসাঁ যুগের ইউরোপ থেকে। সেই সময় ইউরোপের ইটালি অঞ্চলটি অনেকগুলো ছোট ছোট নগর ও জমিদারীতে বিভক্ত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দির শেষ দিকে এই নগরগুলোর কিছু সংখ্যক অত্যন্ত সম্বৃদ্ধ হয়ে উঠে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এদেরই একটি ফ্লোরেন্সে ১৩৯৭ সালে সর্বপ্রথম আধুনিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইটালির বিখ্যাত মেদিচি পরিবারের হাতে গড়া ঐ ব্যাংকটির নাম ছিল “মেদিচি ব্যাংক”। পরবর্তীকালে তার অনুকরণে ইটালির অন্যান্য সম্বৃদ্ধ শহরে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র ইউরোপে ব্যাংকব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলামী ব্যাংকের মত কোন প্রতিষ্ঠান কি মুসলিমদের ইতিহাসে ছিল?

ব্যাংকব্যবস্থা দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে বাগে আনা গেলেও মুসলিম সমাজ ছিল এর প্রভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত। ১৩৯৭ সালেই যেখানে ‘ব্যাংক’ সর্বাধুনিক রূপ পায় সেখানে মুসলিম সমাজ এর আওতাভুক্ত হয় পাঁচশ বছর পরে! সেই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে মুসলমানরা পিছিয়ে ছিল বলে এমনটি হয়েছে সেই ধরণা একেবারেই ভুল। ১৪০০ সাল থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি এবং প্রযুক্তিগত উন্নত রাজ্য ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্য। তাদের দোরগোড়া ইটালিতেই ব্যাংক ব্যবস্থা শুরু হয়। কিন্তু এতো কাছে থাকা স্বত্বেও ৪৫৯ বছর তারা ব্যাংক-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নি। এই সময় অর্থনৈতিকভাবে মুসলিমরা কোন অংশেই পিছিয়ে ছিল না, বরং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় আরো সম্বৃদ্ধ ছিল। কারণ ব্যাংক ব্যবস্থা কোন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক সম্বৃদ্ধির স্বাক্ষর না। এটি একটি প্রতিষ্ঠান যা হাজার হাজার বছর ধরে পৃথীবিতে চলে এসেছে। ব্যাংক কোন জাতিকে উন্নত করতে তো পারে নাই, বরং লক্ষ মানুষের নিঃস্ব হওয়ার কাহিনী এর ইতিহাসের সাথে জড়িত আছে।

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর মক্কা বিজয় (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে শুরু করে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু থাকা ১২৯৫ বছরের ইসলামী খিলাফতের ইতিহাসে মুসলিম সমাজ 'ব্যাংকের' প্রয়োজনীয়তা তেমন একটা অনুভব করেনি। মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম যেই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার নাম ইস্তানবুল ব্যাংক(১৮৫৬)। ব্রিটিশ, ফরাসি এবং সামান্য পরিমাণে ওসমানিয়ান সরকারের যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংকটির কার্যক্রম কেবল কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রচলিত ব্যাংকিং দ্বারা মূলধারার মুসলিম সমাজকে যখন সুদের আওতাভুক্ত করা সম্ভব হল না, তখন সুদ-কেই ইসলামীকরণের চিন্তা শুরু হয়।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে হজ্জের টাকা জমানোর প্রয়োজনকে সামনে রেখে 'ইসলামী' ঘরানার সঞ্চয় পদ্ধতি শুরু হয়। ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় 'পিলগ্রিমস সেভিংস করপোরেশন' এই উদ্দেশ্যে সুদমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে।[2] এই কর্পোরেশন কিস্তিতে টাকা জমানোর সুযোগ দিত এবং কোন ধরনের সুদ দিত না। খুব স্বাভাবিকভাবেই ঐ সময়ে অন্য সকল ব্যাংক তার গ্রাহকদের সুদ দিত। তাই পিলগ্রিমস সেভিংস করপোরেশনে টাকা রাখার তুলনায় ঘরে টাকা রাখাই ছিল উত্তম পন্থা। এক কথায় এই প্রকল্প বিশেষ পরিবর্তন বয়ে আনতে পারেনি।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রাথমিক কিন্তু শক্তিশালী প্রয়োগ করা হয়েছিল মিসরের 'মিট ঘামর' এলাকায় ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সালে। ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল প্রেরণা ছিল জার্মান সেভিংস ব্যাংক। জার্মান ব্যাংকের সাফল্য দেখে ড. আহমদ আল নাজ্জার সেই আদলে মিশরের মিট ঘামার এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু মিট ঘামরের মানুষগুলো ছিল ধর্মভীরু মুসলিম। তারা টাকা পয়সা ব্যাংকে জমা রাখত না।

---

[2] https://islamicmarkets.com/education/historical-development-tabung-haji

এমতাবস্থায়, এই ব্যাংকের উদ্যোক্তার চ্যালেঞ্জ ছিল ২ টি। মানুষকে টাকা জমানোর মর্ম বুঝানো এবং ইসলামী মূল্যবোধ ধরে রেখে কাজ করা। তাই তিনি মিট ঘামরের ঐ ব্যাংকে ৩ ধরনের অ্যাকাউন্ট চালু করলেন - সেভিংস অ্যাকাউন্ট, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট ও যাকাত অ্যাকাউন্ট।

১। যারা টাকা জমা রাখত সেভিংস অ্যাকাউন্টে, তাদেরকে কোন ধরনের সুদ বা উপকার দেয়া হত না, কিন্তু তারা যখন চাইত তখন টাকা তুলতে পারত। (তবে তারা ছোট ও স্বল্পমেয়াদী সুদবিহীন ঋণ নিতে পারতো ব্যবসা-বানিজ্য করার জন্য।)

২। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া টাকা তোলার ব্যাপারে একটু কড়া নিয়ম ছিল, চাইলেই তোলা যেতো না এবং সেই টাকা শরীয়ার অংশীদারিত্ব ভিত্তিতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হতো।

৩। যাকাত অ্যাকাউন্টের টাকা শরিয়া নিয়ম অনুযায়ী গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হত।

প্রথম চালু করা এরকম ব্যাংকিং ৪ বছরে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই ব্যপক সাফল্য পেয়ে যায়। ২৫ হাজার মিসরিয় পাউন্ড থেকে তাদের সেভিংস এই সময়ে বেড়ে ৭৫ হাজারে উন্নীত হয়। আর একই সময়ে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টগুলোয় জমা হওয়া টাকার পরিমাণ ৩৫ হাজার মিসরীয় পাউন্ড থেকে বেড়ে ৭৫ হাজারে উন্নীত হয়। ব্যাংকটার ব্যাপারে এরকম মন্তব্য করা হয় যে তারা অনেক সতর্ক অবস্থায় কাজ করেছিল। ফলে, প্রথম ৩ বছরে ৬০% ঋণের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল।

ড. আহমদ আল নাজ্জারের তৈরি করা এই ‘মিটঘামর ব্যাংক’ বিভিন্ন কারণে দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়। তবে প্রকল্পটা ছিল সবার কাছে খুবই আগ্রহের এবং এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

আধুনিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি হল?

মিট ঘামরের প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ার পর ইসলামী ব্যাংক চালু করার ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের আনাচে কানাচে আলোচনা আসতে থাকে। তবে সেই মডেলকে অনুসরণ না করে এবার আধুনিক ব্যাংকের আদলেই ইসলামী ঘরনার ব্যাংক বানানোর চেষ্টা চলতে থাকে। অর্থাৎ, আধুনিক ইসলামী ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা লাভজনকতায়, ব্যবস্থাপনায়, নীতিমালায় এবং কাঠামোতে প্রচলিত ব্যাংকের মতই। কিন্তু ঋণ আদান-প্রদানটা চলবে শরিয়া আইনে।

পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ও বিশ্বব্যাংকের (World Bank) যৌথ কর্মসূচী "Sturactural Adjustment Programme" এর আওতায় বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা চালু করার কাজ আরম্ভ হয়।

এই ব্যাপারে নাজ্জার-ইব্রাহিম-আনসারী লিখিত 'ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন' তে বলেন।

"১৯৭২ সালের জুলাই মাসের পরেই বিশ্বে প্রথম ইসলামী ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে । আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ কর্মসূচী "Sturactural Adjustment Programme" এর আওতায় বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত দেশের সরকার উদারীকরণ নীতির মাধ্যমে প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অনুমোদন দেয়া আরম্ভ করে । এ ক্ষেত্রে প্রধান ভুমিকা পালন করেছেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তা শামী'য়াল ডারভিশ, আব্বাস মীরাখন ও মহসীন খান ।"

পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে সৌদি আরবের রাজধানী জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থ সংস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোর সম্মেলনে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে এবং সেই বছরই জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসির অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে ‘ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক’ (আইডিবি) চার্টার গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার ‘ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক’-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে সেই চার্টারে স্বাক্ষর করে।

১৯৭৫ সালে সৌদি আরবে ‘ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক যাত্রা শুরু করে এবং ঐ বছরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে ‘দুবাই ইসলামী ব্যাংক’ নামে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ~~এই~~ পরবর্তীতে আই ডি বি’র হাত ধরেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামী ব্যাংক দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, পাকিস্তান, ইরান, সুইজারল্যান্ড, আম্মান, জর্দান ও বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শুরু হয়।

চিত্রঃ ‘নাসের সোশ্যাল ব্যাংক’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে মিসরের কায়রোতে। ধরা হয় এটিই প্রথম ‘আধুনিক ইসলামী ব্যাংক’।

১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে আইডিবির একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসে বেসরকারিভাবে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নিবন্ধিত হয়।

এই দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পকে সংগঠিত করার জন্য, ১৯৯০ সালে অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিং সংস্থা (AAOIFI) খোলা হয়। ১৯৯৬ সালে ইহুদি নিয়ন্ত্রিত সিটি ব্যাংকও ইসলামী ব্যাংকিং বিভাগ চালু করে এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলো শীঘ্রই এই পথ অনুসরণ করে।[3]

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে?

আমাদের অনেকের মাঝে এই ভুল ধারণা কাজ করে যে ব্যাংকে আমাদের টাকা জমা থাকে। কিন্তু এই ধারণাটি বেশ ভালোভাবেই ভুল। ব্যাংকে কারো টাকা জমা থাকে না। এটি একটি ঋণ আদান-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান; অর্থাৎ, ব্যাংক একজনের থেকে ঋণ নিয়ে অপরজনকে তা দেয়। আমরা যখন ব্যাংকে টাকা রাখি, তখন আমরা মূলত ব্যাংক-কে ঋণ দেই। এজন্যই ব্যাংক আমাদেরকে সুদ দেয়। আবার ব্যাংক থেকে আমরা যখন লোন নেই তখন ব্যাংক আমাদেরকে ঋণ দেয়। এজন্যই আমরা

[3] সূত্র-https://crescentwealth.com.au/.../history-and-evolution.../

ব্যাংক-কে সুদ প্রদান করি। এই লোন[4] এবং ডেপজিটের সুদের পার্থক্যই ব্যাংকের লাভ।

আপনি হয়তো ব্যাংকের লকার সেবার নাম ~~হয়তো~~ শুনেছেন। এই সেবার আওতায় আপনি কোন কিছু একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে ব্যাংকের লকারে জমা রাখতে পারেন। ব্যাংক এই লকারগুলো আলাদা করে তৈরি করে এবং নিরাপদে কোন কিছু সঞ্চিত রাখে। আমরা যদি এখানে টাকা বা স্বর্ণ-গহনা রাখি তাহলে নিরাপত্তার মূল্য হিসেবে আমাদেরকে সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। কারণ, লকারে রাখা বস্তু ব্যাংক কাউকে ঋণ দেয় না। এমনকি ব্যাংক যদি দেউলিয়া হয়ে যায় আপনি আপনার জিনিস তুলে আনতে পারবেন। কারণ, আমানতদাতা কোন ঝুঁকি বহন করে না।

সেই তুলনায় ঋণদাতার হিসেব ভিন্ন। সে ঝুঁকি বহন করে। তাই ব্যাংক যখন দেউলিয়া হয়ে যায়, আপনি ডিপজিটের টাকা ফেরত পেতে পারেন, নাও পেতে পারেন। তবে ব্যাংক ডিপজিট সাধারণত সরকার কর্তৃক বীমা করা থাকে। তাই সরকার এই টাকাটা দিয়ে দেয়।[5]

সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ব্যাংকে টাকা রাখা মানে ব্যাংক-কে ঋণ দেওয়া। এই ধরণের ঋণের বিপরীতে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের ধরন অনুযায়ী সুদের হার নির্ধারিত হয়। যেমনঃ ফিক্সড ডিপোজিটে ৫% বা ৭% সুদ, সেভিংস অ্যাকাউন্টে ৪% সুদ এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ০% সুদ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এই টাকা "কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে" ব্যাংক অন্যদের ঋণ দেয় এবং মোটা অংকের লাভ করে।

ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংক উভয়ই এই কাঠামো অনুসরণ করে, তবে ঋণ আদান-প্রদানের বেলায় তাদের মাঝে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

---

[4] ডেপজিটের তুলনায় লোন অনেক বেশি হয়। এই ব্যাপারে আমরা পরে বিস্তারিত জানবো।

[5] বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি নিয়ম করেছে, ডিপোজিটকারীদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা ফেরত দিবে। কারো ডিপোজিট ১ লাখ টাকার বেশি হলে বাড়তি কিছুই ফেরত পাবে না।

ইসলামী ব্যাংকগুলো কীভাবে ঋণ দেয়

প্রচলিত ব্যাংক যখন ঋণ দেয় তার আগে গ্রাহকের থেকে সব ধরণের কাগজ পত্র জমা চায়, যেমন- আয়-রোজকারের হিসেব, ট্যাক্সের বিবরণ, সম্পত্তির হিসেব ইত্যাদি। এই কাগজপত্রগুলো দেখে ব্যাংক গ্রাহকের ঋণ গ্রহণযোগ্যতা যাচাই-বাছাই করে। তারপর, জামানতের (সম্পত্তির) বিপরীতে ঋণ ইস্যু করে। এতোটুকুন পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকের একই। ঋণ অনুমোদনের পর যখন টাকা দেওয়ার সময় আসে, প্রচলিত ব্যাংক গ্রাহকের একাউন্টে টাকাটা পাঠিয়ে দেয়, তারপরে তখন শর্ত জুড়ে দেয়, "সুদে আসলে এই টাকা দ্বিগুণ করে আমাকে ফেরত দিবেন। আপনাকে পাঁচ বছর সময় দিলাম।"

ঠিক একই উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর কাছে আপনি যখন ঋণ নিতে যান, তখন তারা বলবে, "ঋণের টাকায় কী করবেন, জানতে পারি?" আপনি হয়তো বলবেন, "ব্যবসা করব; কিংবা, দোকানে নতুন মাল-পত্র তুলব। ইত্যাদি।" ইসলামী ব্যাংক তখন বলবে, "আপনার ব্যবসা করতে যত প্রকার মাল-পত্র লাগে আমি সব কিনে দিচ্ছি। কিন্তু শর্ত হচ্ছে দ্বিগুণ দামে আমার থেকে কিনতে হবে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে টাকাটা ফেরত দিতে হবে।"

মোদ্দাকথায়, আপনি যখন ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ নিতে প্রচলিত ব্যাংকের কাছে যান, তারা আপনার একাউন্টে ৫০ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে পাঁচ বছরে এক কোটি টাকা ফেরত চাইবে (বছরে ২০ লক্ষ টাকা করে) এবং আপনি যখন ইসলামী ব্যাংকের কাছে যান,

তারা আপনার কাছে ৫০ লক্ষ টাকার পণ্য ১ কোটি টাকায় বিক্রি করবে। তারপরপাঁচ বছরের মধ্যে ১ কোটি টাকা ফেরত চাইবে (বছরে ২০ লক্ষ টাকা করে)।

সুচিন্তিত পাঠক মনে মনে ভাবতে পারেন, সামান্য কিছু নিয়ম-কানুনের কারসাজি ছাড়া এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

ইসলামী ব্যাংক গুলোর পক্ষ থেকে দাবী করা হয়, অন্যান্য ব্যাংক যেখানে 'কাঁচা টাকা' ঋণ দিয়ে বাড়তি টাকা ফেরত নিচ্ছে (বা সুদ গ্রহণ করছে) সেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো পণ্য বা সেবা উচ্চমূল্যে বিক্রি করে একই সমান টাকা লাভ হিসেবে ফেরত নিচ্ছে (ব্যবসা করে)। যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ হারাম এবং ব্যবসা হালাল। তাই ইসলামী ব্যাংক হালাল, কিন্তু বাকি সব ব্যাংক হারাম।

ইসলামী ব্যাংক গুলোর ব্যবসা কাঠামো বিশ্লেষণ

সাদা চোখে ইসলামী ব্যাংকের এই কথাগুলো খুব বাস্তবসম্মত মনে হতে পারে। অথবা মনে হতে পারে ইসলামী ব্যাংকগুলো কোন শরিয়া আইন ভঙ্গ করছে না। তাই পৃথিবীর সবগুলো ব্যাংক-কে ইসলামী ব্যাংক বানিয়ে দিলে সুদমুক্ত বিশ্ব নির্মাণ করা সম্ভব। এই ব্যাপারে আমার খুব শক্ত কিছু অভিযোগ আছে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যবসা কাঠামো বোঝানোর জন্য আমি একটি ছোট গল্পের অবতারণা করি। মনেকরি, নিবিড় একজন তরুণ উদ্যোক্তা। সে চায় একদিন তার

নিজস্ব প্রতিষ্ঠান দেশ জুড়ে কাজ করবে এবং অনেক মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ব্যবসা শুরু করার মত পুঁজি নিবিড়ের নেই। তারপরেও। স্বপ্ন পূরণ করতে সে গেল প্রতিবেশী সুফলের কাছে। সুফল হচ্ছে একজন ধনকুবের যার ব্যাগ ভরা থাকে টাকাতে এবং মন ভরা থাকে লোভে।

নিবিড়ের উদ্যোগের কথা শুনে সুফল খুবই খুশি হল। তবে বিনা লাভে সাহায্য করতে সে রাজি হল না। এদিকে মুসলিম ধর্মালম্বী হওয়ায় টাকা ঋণ দিয়ে বাড়তি ফেরত নিতেও সুফল ভয় পেল। চিন্তা ভাবনা করতে করতে সুফল একটি বুদ্ধি বের করলো।

সুফল নিবিড়ের সাথে ব্যবসা করবে, কিন্তু ব্যবসায় বিনিয়োগ করে লাভ লোকসানের ভাগ সে নিবে না। সুফল চায় সুদের মত সব সুযোগ সুবিধা সে ভোগ করবে কিন্তু ব্যবসার মত ঝুঁকি বহন করবে না। এজন্য সে নিবিড়কে ৫ কোটি টাকা সরাসরি ঋণ না দিয়ে বলল, “তুমি বাজারে গিয়ে নিজের পছন্দমত ৫ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ “আমার নামে” কিনে নিও। কেনাকাটা শেষে তুমি নিজের কাছে নিজেই ১৫ কোটি টাকা মূল্যে এগুলো বিক্রি করে দিও। এই নাও পাঁচ কোটি টাকা। আগামী দশ বছরের মধ্যে তুমি আমার পাওনা বুঝিয়ে দিও।”

কিছু না বুঝে নিবিড় জিজ্ঞাসা করলো, “আমি আপনাকে ৫ কোটি টাকা ফেরত দিব? নাকি ১৫ কোটি টাকা?”

সুফল বলল, “অবশ্যই ১৫ কোটি টাকা দিবে। কারণ ৫ কোটি টাকা তো আমার কেনা দাম। এই যন্ত্রাংশ আমি সাথে সাথে তোমার কাছেই ১৫ কোটি টাকা মূল্যে বিক্রি করব। তারপর সেই ১৫ কোটি টাকাই তুমি আমাকে ১০ বছরে ফেরত দিবে।”

নিবিড় অবাক হয়ে চিন্তা করলো, “সুফল সাহেব কি কারসাজিটাই না করল। ব্যবসার বাহানা করে সুদের সমান লাভ করে ফেলল!”

পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, নিবিড় কেন ৫ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ ১৫ কোটি টাকায় কিনে নিবে? উত্তর হচ্ছে ঋণ নেওয়ার জন্য। বাজারে চলমান সুদের হারে ৫ কোটি টাকা ঋণ নিলে দশ বছর পরে তিন গুণ ফেরত দিতে হয়। তবে সুফল সাহেব যেহেতু এই কাজটা সরাসরি করতে পারছে না,সে ৫ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ ১৫ কোটি টাকায় বিক্রি করে টাকাটা ফেরত নিল। এটাই হল ইসলামী ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সর্বব্যাপী পদ্ধতি।

কেবলমাত্র লাভের দিক দিয়েই যে ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মত তা না। ঝুঁকির দিক দিয়েও ইসলামী ব্যাংকগুলো অন্যান্য ব্যাংকের মতই। ব্যবসা করে নিবিড় যদি সুবিধা করতে না পারে, তাতে ইসলামী ব্যাংকের কিছু যায় আসে না। নিবিড়কে সব পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে। আবার ঋণ নেয়ার পর যদি নিবিড়ের দোকান আগুনে পুড়ে ছারকার হয়ে যায়, তাতেও মোট দায়ে কোন পরিবর্তন আসবে না। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও ১০ বছরে ১৫ কোটি টাকা ফেরত দিতে হবে। কারণ এই চুক্তিতে ব্যাংক কারো ব্যবসা পার্টনার না। সে হচ্ছে অত্যাধিক লাভে এবং খুব কম ঝুঁকিতে মাল সরবরাহকারী সওদাগর। যেহেতু সরবরাহকারী ব্যবসার ঝুঁকি বহন করে না, ইসলামী ব্যাংকও ঝুঁকি বহন করবে না।

এভাবে ব্যবসার আড়ালে ইসলামী ব্যাংকগুলো ঋণ আদান প্রদানের কাজ কৌশলে সেরে নেয়। আপনি চাইলে নিজেও তা প্রমাণ করতে পারবেন। আপনি যদি একটি গাড়ি কিনতে কোন ইসলামী ব্যাংকে ঋণ নিতে যান, ব্যাংক আপনার কাছে গাড়ি

বিক্রি করে দিবে। কিন্তু আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, “ভাই, আপনিতো আমার কাছে গাড়ি বিক্রি করে ফেলেছেন, আপনার ‘ট্রেড লাইসেন্স’টা দেখিতো।” তার উত্তরে ব্যাংক বলবে, “কি যা তা বলছেন! আমিতো ‘ব্যাংক। এখানে গাড়ি বিক্রির লাইসেন্স কোথা থেকে আসবে? আমার কাছে টাকা ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনি আপনার পছন্দ মতন গাড়ি যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে কিনেন। আমি টাকা দিব। আপনি আরও বেশি দামে কেনার হিসেব দেখিয়ে বাড়তি টাকা ফেরত নিব।’ এভাবেই ইসলামী ব্যাংক স্বীকার করবে যে সে কোন ব্যবসায়ী না। সে ঋণ আদান প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। তবে জুতা থেকে সুতা পর্যন্ত যা কিছুই কিনতে আপনি সেখানে যান না কেন, ইসলামী ব্যাংক তাই আপনার কাছে বিক্রি করে দিবে।

ইসলামী ব্যাংক
গাড়ি কিনতে চাচ্ছিলাম। ২০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
তাহলে, গাড়ি কিনে দেই ? প্রতি বছরে ৬ লক্ষ টাকা করে ৫ বছরে মোট ৩০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে দিয়েন।

আপনার কাছে কি গাড়ি আছে যে বিক্রি করবেন ?
টাকা ছাড়া কিছুই নেই তবে সবই দেখানো সম্ভব !

বিশেষ দ্রষ্টব্য - মুরাবাহা (খরচ + অর্থায়ন), বায় মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়) এসব পদ্ধতি সঠিক নিয়ম অনুযায়ী করলে সেটা বৈধ। কিন্তু, ইসলামে ব্যাংকের নব-আবিষ্কৃত পন্থায় কাজগুলো করার মাধ্যমে যদিও সেগুলো কাগজে কলমে বা তাত্ত্বিকভাবে শরীয়াহ বৈধতায় চলে আসে, পুরো ব্যপারটা মোটেই ইসলামী অর্থনীতির আদর্শিক কোনও পদ্ধতির মধ্যে পড়ে না।